গল্পকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বীতশোক ভট্টাচার্য

খেলো অলঙ্করণ হবে যদি এ আলোচনার উপনাম দেওয়া হয় : নবনবতি গল্পে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নবনবীনতা। খণ্ডশ প্রকাশিত যে গল্পসমগ্র গ্রন্থের নির্ভরে এ আলোচনার অবতারণা সেটি প্রায় একশোটি গল্পের সংগ্রন্থন। বড়োগল্প তিনি বিশেষ লেখেননি, মেজো গল্পের দিকে তাঁর তেমন ঝোঁক নেই, তাঁর বেশির ভাগ গল্প ছোটোগল্প; প্রায় একশো-গল্পের জন্যে চিহ্নিত তেরোশো পৃষ্ঠা, এক এক গল্পের জন্যে গড়ে তেরো পৃষ্ঠা। এ সংগ্রহের বাইরে তাঁর আরও গল্প আছে, সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং অগ্রন্থিত, হয়তো তাঁর অমনোনীত গল্পও রয়েছে সে-সব লেখার মধ্যে; আর, গল্পকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ছোটোগল্প লিখছেন। তাঁর সমকালের জীবিত গল্পকারদের এক-আধজনের সাম্প্রতিক লেখা এখন পাঠের যোগ্য, এই পটভূমিতে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে আর-একজন লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছেন, ফলে নিজেকে লেখকের রূপে স্বতন্ত্রভাবে লাঞ্ছিত করার সুযোগ এসেছে, শেষে সারস্বত সমস্যার মানবিক সমাধান ঘটেছে। তাঁর ছোটোগল্পেও একজন কথাসাহিত্যিক আছেন। কোথাও তাঁর ভূমিকা পরোক্ষ। *তেওট তালে কনসার্ট* গল্পটার উদ্‌বাস্তু বৃদ্ধ তাঁকে ভাণ্ড ভরা উপন্যাস পড়তে দেন। *কথাকোবিদ সনাতন হালদার* গল্পে শৌখিন ও শ্রমিক লেখক তাঁর নিজের রচনা সম্পর্কে এই লেখকের মতামত যাচ্ঞা করেন। *নিজেদের শ্মশান* গল্পে তাঁকে কবি তুহিন বোসের শোকসভায় সভাপতিত্ব করতে ডাকা হয়। এখানে লেখক গল্প বলছেন, কিন্তু তিনি পাঠক, আলোচক তিনি। কোনো কোনো গল্পের কেন্দ্রে এক লেখক সশরীর বর্তমান। *আত্মজা ও একটি অস্টিন ১৯২৯* গল্পের মিহির ঘোষাল বোঝে বিশ্ব সৃষ্টির মহত্ত্বের পাশে তার রচনাবলী পণ্ডশ্রম, নিজে ছত্রিশটি উপন্যাস লিখলেও তার প্রকৃত সৃষ্টি এক ছেলে তিন মেয়ে : 'এই তার মোট তিনখানি উপন্যাস—যা কিনা আরো ৫০/৬০ বছর এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে।' মিহির ঘোষাল আরো বোঝে : 'এই যে সে কোনো কিছু টের পায় না—প্রেমের গল্প লিখতে না পারার কারণ এটাই।' এবং তার বড়ো মেয়ে তাকে বোঝায় : 'অনেক তো লিখেছ। এবার কিছুদিন লেখা বন্ধ করো বাবা। অন্যরাও তো লিখবে—। আমরা কতদিন কোথাও একসঙ্গে যাই না বল তো।' তা সত্ত্বেও মিহির ঘোষাল লেখে, স্বপ্নচারীর মতো লেখার জগতে চলে যায়, সেই ঘোরের মধ্যে পাশে ঘুমন্ত বড় মেয়েকে তার মা ভেবে চুম্বন করতে উদ্যত হয়।

সেই মাছটা গল্পের এক 'খারাপ' ছেলে শঙ্কর সহপাঠীদের গল্প শুনিয়েছিল, ক্লাস ফাইভের রোল নাম্বার সেভেনটিন একদিন ভৈরবের জলে তলিয়ে গিয়ে পঞ্চাশ বছর পরে বিশাল এক ঢাইন মাছ হয়ে কিভাবে ভেসে উঠল তার গল্প, এ গল্পের ঢাইন মাছ ইশকুলের দিনগুলি থেকে ক্রমাগত তারুণ্যে প্রৌঢ়তায় মৃত্যুর সীমান্তে আরও আরও বড়ো হয়ে হয়ে চেতনায় ঘাই দিতে লাগল, পড়বার পর গভীরতর হল ব্যাপ্ততর হয়ে উঠল শিল্পসৃষ্টির রহস্য। বাস্তবকে মায়ায় আচ্ছন্ন করে মমতায় পুনরাবিষ্কারের এই সূত্রপাত, সম্ভাব্যতার পরিবর্তে বিশ্বাসযোগ্যতাকে স্বীকৃতির এই পরিণতি সৃজনী প্রণালীকে চিহ্নিত করতে করতে এগিয়ে যেতে চায়। সৃষ্টির প্রক্রিয়া রহস্যময়, রূপদক্ষতার সে-পদ্ধতিকে শ্যামল বস্তুগত ভিত্তি দিতে পারেন, এতে বস্তু আক্ষরিক অর্থে ভৌতিক ব্যঞ্জনা পায়। গল্প আর গল্প আর গল্প থেকে উপন্যাসে চলে যাওয়ার আর-একটি সূত্রও শঙ্কর দেখায়, বাংলাভাষী অনেক গল্পকার এ পথ ধরে উপন্যাসের পথে যাত্রা করেন। *চোরাস্রোত* গল্পের পরিতোষ আপাত কার্যকারণ সম্পর্করহিত লুপ্ত রহস্যময় যোগাযোগের পথ বার করতে চায় সেই পথই শিল্পীর চরম অন্বিষ্ট এ কথা শ্যামল জানেন। তাই *মেজবাবুর পেটিকেস* গল্পে দেখাতে পারেন তেতাল্লিশটি উপন্যাসের আটচল্লিশ বছরের পাতিবাঙালি লেখক অক্ষয়বাবু আঁকাড়া অভিজ্ঞতার খোঁজে মত্ত হয়ে লাল আলোর এলাকায় গিয়ে উঠলে মেজোবাবুর হল্লায় পড়ে থানায় চালান হলে ও.সি. শেষপর্যন্ত নভেলিস্টকে চিনতে পেরে উদ্ধার করে। গল্পের পাদটীকায় ও.সি.-র মহার্ঘ মন্তব্য : দেখতে হয় আমাদের বলে যাবেন। সব তো আনরেজিস্টার্ড। তবু লেখকজীবন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ব্যঙ্গের থেকে বেশি বেদনার সামগ্রী। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে বিধৃত লেখক চরিত্র প্রথমত ও প্রধানত ঔপন্যাসিক, তবে *উত্তরকুরুক্ষেত্র* গল্পের অমলবাবু তিরিশ বছরে আশিটি গল্প লিখেছেন, শ্যামলবাবুর লেখক জীবন আরও দীর্ঘ, তাঁর গল্পের সংখ্যা আরও বেশি।

সৌন্দর্যের দূরত্বের ক্ষয় নেই, জীবন যেমন তেমনি শিল্প ঘনিষ্ঠ সংসর্গে এসেও অপ্রাপ্তির অশেষ বোধের পরিচয় দেয়। লেখকের আত্মপরিচয় এবং রচনায় তাঁর আত্মপ্রক্ষেপের শিল্পায়াসের মূল্যাঙ্কন হতে পারে লেখকের আপনাকে চেনা ও সেই চেনার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও জীবন চেনার অন্বিত নিরিখে। *মাছের কাঁটার সফলতা* গল্পে শতবার্ষিক উদ্‌যাপিত হবার চার বছর পরেকার কবিকে, সম্ভবত কবি জীবনানন্দকে, প্রেক্ষাপটে রেখে লেখক সমাবেশের এক কৃতকৃত্য এবং তাই অস্বস্তিকর পরিবেশ রচিত হয়, অনতিসফল লেখক নারায়ণ চক্রবর্তীর চোখে এই ধরনের অনুষ্ঠানের নিরর্থকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। 'এখন ষাটের কাছাকাছি এসে

সে পরিষ্কার বলতে পারে সরি! একটা বড়ো ভুল হয়ে গেছে স্যার! আমি ঠিক লেখক নই।' এ উচ্চারণে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর চিনে নেওয়া যায়, সনাক্ত করার জন্যে খুব একটা প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না, রূপান্তরণের অনচ্ছ পরদাটুকুও উড়িয়ে দিয়ে লেখক নারায়ণ চক্রবর্তী বাস্তবের সাহিত্যিকদের চিনিয়ে দিতে এগিয়ে যেতে থাকেন : 'এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই নয়নসিন্ধু বুকের লাইনে কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। তিনি নিজে বিলিতি অভিজ্ঞতা থেকে কয়েক খণ্ডে একদা উপন্যাস লিখেছেন। এখন পনেরো বছর হল চুপচাপ এপিক লিখে চলেছেন। গরম ফিসফ্রাইয়ের জন্যে প্লেট এগিয়ে দিয়ে তাঁর মনে হলো—অসুখী দাম্পত্য জীবন অনেক সময় কবিকে দিয়ে মহান কবিতা লিখিয়ে নেয়। নইলে—। ভালো করে পেছনে তাকালেন নয়নসিন্ধু। তাঁর দুজন পরেই তাঁর সহধর্মিণী সুহাসিনী।' চুরাশি বছরের এই নয়নসিন্ধু ও তাঁর স্ত্রীকে অন্নদাশঙ্কর রায় ও লীলা রায় বলে এক নজরে চিনে ফেলা যায়। অন্নদাশঙ্কর শ্যামলের অগ্রজ গল্পলেখক, বাস্তব উপাদান তাঁর কথাসাহিত্যেরও মূল উপকরণ, কিন্তু অন্নদাশঙ্কর ব্যক্তিগতভাবে এসব ক্ষেত্রে মনে করেন সত্যকে 'সারকামভেন্ট' করে চলতে হয়, তাতে অপ্রিয় সমালোচনার ক্ষত ও ক্ষতি এড়ানো যায়, কিছুটা বোকা বানানো যায় মনস্ক পাঠককে। শিল্পসৃষ্টির এই পথটিতে চাতুরী ও অসততার প্রলোভন রয়েছে, হুবহু বাস্তবকে রচনায় কতখানি অবিকলভাবে গ্রহণ করা সম্ভব? এ প্রশ্ন শ্যামলেরও ছোটোগল্প আলোচনা প্রসঙ্গে এসে পড়ে। মিথ্যে বলা মানে তো শুধু সত্য না-বলা নয়, তা আরো অনেক কিছু।

বিভূতিভূষণের গল্পের মতো শ্যামলের গল্পেও ঊনলেখকেরা ফিরে ফিরে আসেন, বিভূতিভূষণের মতো মমতা দিয়ে শ্যামল এ সমস্ত লেখকের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন, শ্যামলের গল্পের প্রকাশের ভঙ্গি স্বাভাবিকভাবে তুলনায় তির্যক, গল্প কথকের নিজের রচনার অসমাপ্তি ও সীমাবদ্ধতার পটভূমিতে এ সমস্ত হবু লেখকের রচনা মূল্যায়নের এক সহৃদয় ও সমীচীন ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। *ভেওট তালে কনসার্ট* গল্পের লেখকরূপে যশের প্রার্থী গণেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর বার্ধক্য, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, পণপ্রথা, বর্ণাশ্রম, ইতিহাসের নিজস্ব পাঠের প্রতিক্রিয়াশীলতা সত্ত্বেও গল্পলেখক শ্যামলের কাছাকাছি চলে আসতে থাকেন, তার কারণ শুধু গণেন্দ্রনাথের আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা আর পূর্ববঙ্গের প্রতি এবং অব্যবহিত ইতিহাসের প্রতি পিছু টান নয়, এ জন্যে এ গল্পের শেষে সেই লেখক গণেন্দ্রনাথ বলেন : 'আপনি আমার 'অসবর্ণ' লেখাটি পড়িয়া চটেছেন। মত পার্থক্য হইতেই পারে। এইবার আপনি আমার উপন্যাস পড়েন—মিলনমন্দির—অগ্নিকন্যা—দুই ভাগু। দ্যাখবেন এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শুদ্র চরিত্ররা মিলিয়া মিশিয়া ঘোরতেছে। সেটা যে কথাসাহিত্য কিনা! বোঝলেন

নি।' কথাসাহিত্যের এই মুক্ত প্রাঙ্গণে লেখক পাঠক চরিত্রদের উদার সঞ্চরণ। গণেন্দ্রনাথ অবিরল পত্র রচনা এবং আঞ্চলিক ইতিহাস রচনা তাঁর কথাসাহিত্যের সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে দেয়। *কথাকোবিন্দ সনাতন হালদার* গল্পের ভাবী কথাসাহিত্যিক সনাতন আসলে আধাগঞ্জের ছোটো গ্রিল কারখানার বিত্তবান পরিশ্রমী মিস্ত্রি ও চাষি, কিন্তু নিজের কাছে সে পাঁচ ছয় বছরের তন্নিষ্ঠ লেখক, স্বশিক্ষিত এই মানুষটি অন্যদের লেখা পড়ে নির্জনে লিখে চলেছে, প্রতিষ্ঠিত এক লেখকের কাছে সন্তর্পণ সংকোচে মতামত জানতে এসেছে। তার রচনার প্রসঙ্গ পুরোনো, গদ্যে সাধু ও চলিত ক্রিয়াপদ একাকার, হাতের লেখা আরও কাঁচা, গোল করে পাকানো তেল ময়লা লাগা তার পাণ্ডুলিপি বার করে সে জানতে চায় : লিখেছি কেমন? বিভূতিভূষণের মতো শ্যামলও এক্ষেত্রে নিরাশ করেন না, বলেন, 'গুণ আছে', আর শ্যামলের সঙ্গে এ গল্পের পাঠকেরাও যেন যোগ দিয়ে বলতে পারেন : ভালোই তো। *অমৃতযোগ* গল্পের অথর্ব বৃদ্ধ পিতা বর্ষ অনুক্রমে আত্মজীবনী লিখে নিপুণভাবে গুছিয়ে রেখে যান। জীবনের এই অপরিশোধিত উপাদান শ্যামলের শিল্পে নিবিড় শ্যামলতায় অলঙ্কৃত হয়। *শিয়ালদা কেমন আছে* গল্পটিতে এক মহাভারত অনুবাদক শিক্ষকের প্রসঙ্গ আছে, অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ পিতা স্রষ্টা বেদব্যাসের মতো পদ্য ছন্দে মহাভারত অনুবাদ করে চলেছেন—জীবনকে শিল্পে রূপান্তরণের এই গরিমা ও লঘিমা গল্পকারের রচনা হতে বিশেষ প্রাপ্তি।

তারসানাই উপন্যাসে যেমন তেমনি তাঁর একাধিক গল্পে শ্যামল লেখক চরিত্রকে শিল্পী চরিত্রে অনুবাদ করেছেন, গল্পকারের অবলম্বন যে বাস্তবতা তা বস্তুভিত্তি সমেত সংগীতের মূর্ছনার মধ্যে মিশে গিয়ে বিমূর্ত শিল্পের এক অধিসৌধে পরিণত, এবং গায়ক বা বাদককে সেই চূড়ান্তে তিনি মূর্ছিত করে রেখেছেন, ভাব-সমাধি ভেঙে দেবেন বলেই যেন এত সব কাণ্ড, শ্যামলের *পরী* গল্পের পরিবেশ বিভূতিভূষণের পাঠকের কাছে পরিচিত বলে প্রতিভাত হয়। অতিষ্ঠ গৃহকর্ত্রী তেমনই গঞ্জনা দেন : 'ক পালি চাল আছে ঘরে শুনি? রোজ রোজ লোক ধরে আনা চাই।' তেমনি পরিচিত মনে হয় প্রৌঢ় সদানন্দ তন্ময় গ্রাম্য বেহালাবাদক বিপিনবাবুকে, কথকের প্রায়-তরুণীবধূ জ্যোৎস্না রাতে অঙ্গণে এসে দাঁড়াতেই বিপিনবাবুর বেহালার ছড়ের টানে বেহাল পরি ধুলোর বাস্তবতায় নেমে আসে : বিশ্বাসযোগ্য সেই আবির্ভাব, এমন কি তা সম্ভবপর বলেও প্রতীয়মান হয়। *ভালোবাসলে মেঘ হয়* গল্পে অশীনদার প্রশ্ন : মৃত্যুর পর রেকর্ড কিনে তাঁর গান শোনা হবে কিনা? এ জিজ্ঞাসার সঙ্গে এই বিমূঢ় কৌতুক বিস্মিত বেদনা সঞ্চারিত করে দেয়। কোকিলও গায়, কিন্তু তার এল.পি. নেই, রয়্যালিটি নেই। স্বত্বভোগী শিল্পী আয় ও আয়ুর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা

করতে চায়, প্রেমকে যথাযথ মূল্য দেবে বলে ভাবে, আর এই সমস্ত আঘাত সংঘাতের মধ্যে শিল্পীর চরিত্র স্বকীয় ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে মনে করে। *অপমানের স্বাদ* গল্পে পরিতোষ সরখেল বিখ্যাত সরোদিয়ার আপাতসাফল্যের ছদ্মকৃতার্থতার নির্ধারিত বৃত্ত থেকে, যশস্বী শিল্পীর নিয়তির মতো নাছোড় প্রভামণ্ডল থেকে জীবনে ফিরতে চায়, আদি এবং অকৃত্রিম নিজত্বে ফেরাতে চায় আপনাকে। রাতের মিনিবাসে অটোতে সাইকেল ভ্যানে অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরতে চাওয়া এই সফল ও টলমল প্রৌঢ় নাগরিকের ভূমিকা আসলে অস্তিত্বের দংশনে কাতর যে কোনো কৃতী ও সংবেদনশীল মানুষের নামভূমিকা, তাই 'আমি উঠলাম—আপনারা সবাই নেমে যাচ্ছেন' এ উক্তি একই সঙ্গে ট্রাজেডির উপাদান ও কমেডির উপকরণ, তাই এ গল্প শ্যামলের *বেঁচে থাকার বিশেষ উপায়* গল্পটিতে প্রায় অবিকৃতভাবে ফিরে আসে।

উপভোক্তা ও স্রষ্টার সম্পর্ক সংস্কৃতির সমাজতত্ত্বের প্রসঙ্গ, পাঠক ও লেখকের সম্বন্ধের সাহিত্যতাত্ত্বিক আওতা পেরিয়ে তার পরিসর বিস্তৃত। এ সম্পর্ক শ্যামলের একাধিক গল্পের প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে। *অ্যানাটমি* গল্পের সমজদার সদানন্দ নিজে শৌখিন চিত্রশিল্পী, আর অলকেশ স্থাপত্যের অধ্যাপক, শৌখিন চিত্রশিল্পী সেও, অলকেশ আর সদানন্দ দুজনেই নাটক দেখতে ভালোবাসে। অলকেশ মনে করে তার বেহালার একটি চমৎকার গৎ বাজানোর পেছনেও অনেক ন্যুড স্টাডির বস্তুভিত্তি আছে, এবং অলকেশ আচমকা সদানন্দকে নগ্ন করতে দেখতে চায়, শিল্পীর তন্ময়তা দিয়ে আবিষ্কার করতে চায় মানুষের শরীরাংশেরও পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, কিন্তু এটা কোনো গে-গল্প নয়, তাই অলকেশ সদানন্দকে নগ্ন করতে চাইলেও পারে না। কেনেথ ক্লার্ক-এর আলোচ্য নগ্ন পুরুষের শিল্প সার্থকতা থেকে গল্পটি শেষে উলঙ্গ বাস্তবতায় ফিরে যায়, হতে-পারতো মডেল সদানন্দ স্কুটারের ওপর পুতুল হয়ে বসে তাদের সাবেকি বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে। *পুরকায়েতের আনন্দ ও বিষাদ* গল্পটি এ সূত্রে প্রাসঙ্গিক, সতেরো বছর ধরে বাজনার সমজদার শ্রোতা অবিবাহিত ও একাকী হিমানীশ বসুরায় ঝালা ও জোড়ের কাজের জন্যে ভারত জুড়ে খ্যাতিমান সেতারি কমল পুরকায়েতকে নির্জনে হত্যা করে শিল্পীর শেষ তদ্‌গত সৃষ্টির স্বগত সাক্ষ্যকে মূল্য দেবে ব'লে ভাবে। উভয়ক্ষেত্রে মানবিক একাকিত্ব শিল্পীর একাকিত্বকে অস্তিত্বের তাৎপর্য দেয়, উভয় ক্ষেত্রে মুক্তি আসে ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। পূর্বোক্ত গল্পটিতে অস্তিত্বের দুর্বহ ভার অনেক বেশি, সে তুলনায় হননের দ্বারা প্রিয় বস্তুকে চিরকালীন মর্যাদা দেবার সংকল্প রোম্যান্টিক। শ্যামলের গল্পে স্রষ্টা ও সহৃদয় সামাজিকের এই দূরত্ব শেষ পর্যন্ত অলঙ্ঘ্যভাবে থেকে যায়। এবং এ দূরত্ব মানুষ

ও মানুষের যোগসিদ্ধ দূরত্ব নয়, শিল্প ও মানুষের দূরত্বটি মানুষ ও মানুষের দূরত্বের যোগে আরো সুদূরের প্রতীতি অর্জন করে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *রেকর্ড* গল্পের সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে লেখা গল্প *ঝিঝোঁটি দাদরার* কাহিনিতে পঞ্চাশ বছর আগেকার ফিল্মের এক পুরোনো জনপ্রিয় গানের রেকর্ডের মধ্যবর্তিতায় দুজন সংগীতপ্রিয় মানুষ সহসা পরস্পরকে এবং নিজেদেরও আবিষ্কার করে। অর্ধশতক ও ওপার বাংলার ইতিহাস ভূগোল পেরিয়ে এসে তারা জানতে পারে যে একদা তারা দুজনেই প্রতিবেশী ছিল, একত্রে কেটেছে তাদের সমবয়সী শৈশব। মানুষ পঞ্চাশ বছর আগেকার প্রিয় গান যদিও চেনে, পঞ্চাশ বছর আগেকার প্রিয় মানুষকে চেনে না, পঞ্চাশ বছর আগেকার নিজেকেও চেনে না, এ সত্য, এবং এই আশ্চর্য।

এক বন্ধু পড়ে আছে গল্পের অকালপ্রয়াত অরুণ চরিত্র গড়ে উঠেছে কবি শংকর চট্টোপাধ্যায়ের আদলে, আর অরুণের গল্পকার বন্ধু মহীতোষ আসলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজে—এভাবে শনাক্ত করতে এগিয়ে যেতে প্ররোচনা দেয় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প, পাঠককে যেন এক বিপজ্জনক খেলায় অংশ গ্রহণ করতে ডাক দেয় : জীবনের প্রতি পুরোপুরি আনুগত্য আছে বলেই শিল্পের প্রতি এর বিশ্বস্ততা পূর্ণমাত্রায়—যাচাই করবার এই খেলা সতর্ক এবং প্ররোচক। একই বিষয় নিয়ে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্প আছে, তুলনা করলে শ্যামলের রচনাটিই গল্প হয়ে উঠেছে মনে হবে। শংকর চট্টোপাধ্যায় নামক ব্যক্তিত্বের তন্নিষ্ঠ সংশ্লেষকের জন্যেই এ গল্পের আধার ও আধেয়র এই যৌগ প্রণীত হতে পারল, এমন সন্দেহ অথচ অমূলক নয়। *নিজেদের শ্মশান* গল্পে কবি তুহিন বোসের জীবন ও মৃত্যুর কথা বলতে গিয়ে শ্যামল কবি তুষার রায়ের বর্ণবান ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গের নির্ভরে এমন একজন শিল্পীর বিষয়ে আলোচনা করেন যাঁর কল্পনা ছিল যেন সত্যের চেয়ে বেশি বাস্তব। কিন্তু গল্পটিতে কল্পনা ও বাস্তব, মৃত্যু ও জীবন সন্তুলিত হয়, কথক তুহিনের শোকসভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়ে তাদের পারিবারিক শ্মশান দেখে ফিরে আসেন। তুহিন বোস নামক জীবন্ত ব্যক্তির ধ্বংসস্তূপের প্রসঙ্গ থেকে গল্পটি এক অবক্ষয়ী পরিবারের বৃত্তান্ত পরিক্রমা করে গল্পটি কিন্তু আবারও জীবন থেকে শিল্পের চক্রে চলে আসে, ক্যাবারে ড্যান্সার মিস রুপোলি পিসির সগর্ব উল্লেখে অবক্ষয়ী শিল্প এবং জীবনের সংলগ্নতার আর একটি সূত্র রচিত হয়।

শিল্পের শর্ত পূরণ করতে চেয়ে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এক নতুন সাপেক্ষবাদের আশ্রয় নেন। ইতিহাসের কালিক বোধ ও বাস্তব সময়, ভূগোলের স্থানিকবোধ ও বাস্তবের অবস্থান সবই কল্পনার বিবেচনায় আপেক্ষিক সত্যতা অর্জন করে, অন্ধ অনুকৃতি থেকে তাঁর গল্প আলোয় ভরে উঠে আসতে থাকে অনুসরণের—উৎকল্পিত

রচনার—একটি ধারা বেয়ে। শ্যামল ক্রমশ পাঠককে জানিয়ে দেন লোকে যাকে বলে সত্য বা বাস্তব সে-সত্যতা সে-বাস্তবতা এক উৎকেন্দ্রিক কল্পনার চাপে শিল্পের বৃত্তে ধরা দেয়। সে উৎকল্পনা আকাশে পল্লবিত হলেও তার শেকড় বাস্তবতায় চারিয়ে যেতে থাকে। তাঁর গল্পগুলি তাদের নিহিত প্রামাণিকতা এবং স্বাশ্রয়ী সম্ভাব্যতার স্বতন্ত্র শর্তসাপেক্ষে গল্প রচনার প্রচলিত প্রকরণ, আখ্যান রচনার প্রথাগত রীতি ইত্যাদিকে আপাত স্বীকৃতি দিয়ে তাদের স্বকীয়তার পথ ধরে ততক্ষণ অগ্রসর হয়ে যেতে থাকে, যতক্ষণ না পাঠক তাদের ভার ও রূপকে বাস্তবতার গ্রহণযোগ্য প্রতিস্থাপন বলে মেনে নেয় ততক্ষণ তাদের অভিমুখের পরিবর্তন হয় না, পাঁচপাঁচি বাস্তবতার থেকে তাদের মুখ ফেরানোই থাকে। শিল্পী শ্যামল যা থেকে তাঁর সৃষ্টির আকরিক সংগ্রহ করেছেন তাঁর পাঠক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত থেকে, জ্ঞান-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা ও প্রপঞ্চ রচনা ক্ষমতার অধিকারী হয়ে তাঁর এ জাতীয় গল্প উপভোগ করতে পারেন এবং সাধারণ বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করেও অসাধারণ বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের এই শিল্পমূল্যে শ্যামলের গল্প গরীয়ান। *আবার কুরুক্ষেত্র* গল্পের লেখক সরোজকিশোর ঐতিহাসিক গল্প লেখার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় ইতিহাস গোলা অবিস্মরণীয় গল্প নিয়ে পরাগদার আর্বিভাব ঘটল। সরোজকিশোর সম্ভবত শ্যামল নিজে, কিন্তু পরাগদাও ঘনাদা নন, পরাগরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃত পক্ষে পরাগ চট্টোপাধ্যায়, তিনি এক বাস্তব অস্তিত্ব, তিনি সত্যই সুন্দর বৈদিক উচ্চারণে বেদগানে সক্ষম, কয়েক দশক ধরে সত্যই বেদপাঠে নিরত, এ কথা যথার্থ যে তখনও তাঁর অবসর গ্রহণে সামান্য বাকি, তাঁর বড় দুই মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে, ছোটোটি এম.এ. পরিক্ষার্থিনী। ধবল নামে এক রজকপুত্র বহু বছর ধরে সত্যই তাঁর সংসার দেখে। খাড়া নাক স্বপ্নময় চোখ লম্বা চওড়া এক সময় ফর্সা বিপত্নীক এই মানুষটি জীবনে অবিকল যেমন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে ঠিক সেভাবে তাঁর গল্পের মধ্যে তুলে নিয়েছিলেন, তুলে নিয়েছিলেন পরাগ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাইডি' উচ্চারণ সমেত। বৈদিক যুগে নারী নামে তাঁর পাণ্ডুলিপিসুদ্ধ, এবং পরাগ চট্টোপাধ্যায়ের উন্মাদ অনুমানকে তাঁর গল্পের আবহ ও দর্শনে প্রত্যয়সিদ্ধ করে তোলার কাজে তিনি পুরোপুরি সার্থক হয়েছেন। তাঁর সমকালীন গল্পকার অসীম রায়ও জীবন থেকে গল্পের আকর আহরণ করে তার শিল্পিত রূপ দেওয়ার দুঃসাহসে সেভাবেই কৃতী, কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের পথ আলাদা।

জীবন থেকে শিল্পে এবং শিল্প থেকে জীবনে যাওয়ার আর আসবার দুটো পথ শ্যামল খোলা রাখেন। কিন্তু শ্যামলের মধ্য শ্রেণির নাগরিক প্রৌঢ় পুরুষ চরিত্র নেশার ঘোরে এবং তরলতার ঝোঁকে আদিমতার দিকে দু-পা এগিয়ে কেবলই তিন

পা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হয়। *নিশীথে সুকুমার* গল্পের সুকুমার মদের ঝোঁকে রাতের বারান্দায় নগ্ন নাচ শুরু করে দেয়, বস্ত্রাবৃতা স্ত্রীকে স্বামীর নগ্ন নাচের ধর্ম নেবার জন্যে সে আহ্বান জানায়, সে আবাহন কাপড়ের পুঁটলি তার সহধর্মিণীকে স্পর্শ করে, কিন্তু জাগাতে পারে না। ডি.এইচ. লরেন্সের গল্পে নগ্ন স্ত্রীর সূর্য স্নান পোশাকি স্বামীর দূরত্ব ও হীনতার বোধ বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু এখানে স্ত্রী তো দূরের কথা, স্বামী সুকুমার নিজে মাত্র একটা লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে ঘরে যাওয়া যায় জেনেও সে দূরত্ব টপকাতে পারে না। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে এইসব কৃতদার ও অকৃতদার প্রৌঢ়েরা আসে, আসতে থাকে। *মানুষ হারায় কেন* গল্পের অমিতাভ আবিষ্কার করে তার চির চেনা কলকাতায় সে যে এখন আগন্তুক, তার কাজে মন নেই, কারও সঙ্গে কথা বলে সে স্বাদ পায় না, তার পুরোনো চেনা মানুষেরা হারিয়ে গেছে, এমন কি স্ত্রীর সঙ্গেও তার দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে মনে হয়। এক প্রৌঢ়ের কাহিনি এমনিভাবে অস্তিবাদীর নির্বেদে ঢলে পড়তে চায়। এ জীবন নিয়ে আমি কী করব? এ মূল প্রশ্নের উত্তর খোঁজে অমিতাভ, আর তার স্ত্রী উত্তরা মুখ হাঁ করে ঘুমোয়। কাদায় শায়িত ও তৃপ্ত মহিষীর পাশে এই মানুষটির উঠে দাঁড়ানো পাঠক লক্ষ করতে থাকেন, কিন্তু ভাঙা অমিতাভ একটা ভাঙা মিছিলের মধ্যে ঢুকে পড়ে স্লোগান দিতে দিতে কোথায় হারিয়ে যায়। রাজনীতির দায়বদ্ধতা অমিতাভদের অস্তিত্বের সমস্যার সমাধান হয়ে আসে না।

শ্যামলের গল্পে পাগলেরা এই অমিতাভ ধরনের মানুষগুলির অস্তিত্বের সাঁকো ধরে নাড়া দেয়। *একজন নিরাপদ ভীরুর কেচ্ছা* গল্পে বিশ্বনাথ হাজরা সেই মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু গৃহস্থ চাকুরিজীবীর শ্রেণি প্রতিনিধি। সে সতেরো নম্বর বস্তির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার কথা ভাবে, তার বয়স্ক সন্তানেরা আক্ষরিক অর্থে সুদূর এবং সে ভোরে অমূল্যের ফুটপাতের দোকানে চা খেয়ে মাটির কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে। বিশ্বনাথ একবারই ঝুঁকি নিতে চেষ্টা করে, অমূল্যর পোলিও-প্রতিবন্ধী শেকলবাঁধা পাগল কিশোর ছেলে সমীরকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না, অসহায় অসুস্থ ছেলেটিকে একা হাওড়া ব্রিজে ছেড়ে দিয়ে সে বাড়ি চলে আসে। সমীর তাকে সত্য বলেছিল : পায়ে শেকল থাকলে তো পালানো যায় না। কিন্তু বিশ্বনাথের মনে এ কথা ধাক্কা দেয়নি, অমূল্যর ছেলেকে হারিয়ে ফেলে সে পরের দিন সকালে অম্লান মুখে অমূল্যের কাছে চা চায়। এ গল্প মতি নন্দীও যেন এত নির্মমভাবে লিখতেন না। *মানুষ হারায় কেন* গল্পের প্রৌঢ়া নারীটির মধ্যে যখন পাগলামি দেখা দেয় তখন সে বড়ো রাস্তায় হারিয়ে যাওয়ার কথা বলে। কিন্তু হারানোর রাস্তা ক্রমশ বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। *গত জন্মের রাস্তা* গল্পে ছেলেবেলার প্রিয় ভাই নব

পাশে থাকলেও প্রৌঢ় শশাঙ্ক আর শৈশবের অমল সান্নিধ্যে ফিরতে পারে না। কিন্তু তাদের হারিয়ে যাওয়া কুকুর বাঘা ঠিক কী করে যেন পুরোনো মনিব শশাঙ্ককে চিনতে পেরে যায়। *নেই* গল্পের চাকুরে মানুষটির চাকরি চলে যাওয়ার দুঃখ হঠাৎ রাজনীতিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির মৃত্যু উপলক্ষে হাফ ডে ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার আনন্দে পর্যবসিত হতে হতে বিষাদে পরিণতি পায়। কোথাও তার যাওয়ার জায়গা নেই, কিন্তু তার এগোনোর স্বাধীনতা আছে।

বিলাসখানি গল্পের গবেষক ডক্টর নীলমাধব স্মৃতি স্বপ্ন কল্পনা মিলিয়ে আত্ম উৎক্রমণের পথ খুঁজতে গিয়ে পাগল প্রতিপন্ন হন। উচ্চশ্রেণির সমস্যা এক্ষেত্রে মধ্যশ্রেণির সমস্যার সঙ্গে স্বরূপে এক আকার পায়। *নবকান্তর আবিষ্কার* গল্পে স্ত্রী আবিষ্কার করে নবকান্তর নবার্জিত বোধ আসলে তার পাগল হওয়ার আগের অবস্থা। *ইয়ার্কি* গল্পে স্বপ্ন আর বিষাদের মাঝামাঝি রেখায় দাঁড়িয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে সীতাংশু তাকিয়ে থাকে। নারীরা বোধতাড়িত প্রৌঢ়দের এরকম ভুল বোঝে। শ্যামলের গল্পে নারীদের সংস্পর্শে এসে তরুণরাও প্রৌঢ়ত্বের পরিণতিতে পৌঁছে যায়। উপন্যাসের বীজ বহনকারী গল্পে প্রমথ অনুভব করে বটে তাকে ঘিরে সুধা আর তার বোনের আশা আকাঙ্ক্ষার টান ভালোবাসা, কিন্তু প্রেম তাকে অসাড়তা অপ্রেমের দিকেই নিয়ে যায় যেন। সমরেশ বসু বা বিমল করের মতো অগ্রজ লেখক একটি পুরুষ ও কয়েকটি বোনের গল্প যেমন সংরাগে মমতায় রচনা করেন এখানে তার অভাবটুকু যেন দেখিয়ে দেওয়া হয়। তবু নারী এই সব প্রৌঢ়দের কাছে বাঁচবার একটি সম্ভাব্য রাস্তার অন্য নাম হয়ে উঠতে চায়। *সুড়ঙ্গ* গল্পে বাড়িউলি পুতুল তার বুকে মুখ ঘষা ভাড়াটে দিলীপকে একশো টাকা ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব দিলে দিলীপ রাজি হয়। সে সময় পুতুলের তরুণী মেয়ে সহসা আবির্ভূত হয়ে পুতুলকে যেন অনুযোগ করে : তোমরা আবার ভাড়ার কথা তোলোনি তো। *বন্ধুপত্নী* গল্পের লেখক এ গল্প পড়লে খুশি হতেন। অমিয় শ্যামল বিকাশ *কর্কটক্রান্তি* গল্পের তিন উত্তর যৌবন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, তাদের ডাকবাংলো মদ মাংস জুয়োখেলা খোলা গায়ে নদীতীরে বেড়ানো কিছুই তাদের এ সত্যটি ভুলতে দেয় না : চারটি সুবেশা তরুণী এই অচেনা পটভূমিতে তাদের একজনের দিকেও একবারের জন্যেও তাকায়নি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গল্পটি হয়তো অন্যভাবে শেষ করতেন। শ্যামল এই প্রৌঢ়দের মহানগর থেকে নির্জন ডাকবাংলোয়, গঞ্জ মফস্‌সল থেকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে দেখান যে তাদের অনুভূত সেই বোধের রকমফের ঘটে না। *ছায়া পূর্বগামিনী* গল্পে টিফিনের সময় ঘরে বিশ্রামরত গিরীনবাবুর কাছে ব্যবস্থা মতো একটি নারী আসে, সঙ্গের শিশুপুত্রটিকে ঘুম পাড়িয়ে সে গিরীনের সঙ্গে মিলিত হতে চায়, শিশু ঘুমোয় না, মেয়েটি চলে যায়, এগারো

টাকা বেঁচে যায়, আর বাঁচে প্রেমিকের সততা। মধ্যশ্রেণির এই দ্বিচারিতা শ্যামলের গল্পে কশার আঘাতের মতো আছড়ে পড়ে। *ধানকেউটে* গল্পে গ্রামে শহুরে বাবু অমৃতলাল তার স্ত্রী রেবাকে লুকিয়ে তাদের কাজের মেয়ে বহুপ্রসু অথচ সমর্থ বেস্পতির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে, বেস্পতি এই গোপন মিলনের কথা তার স্বামী এবং অমৃতলালের মজুর সনাতনকে জানতে দেয় না। যে ইঁদুরের গর্তে সাপ থাকে সেই ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান বার করে নেওয়ার জন্যে অমৃতলাল সনাতনকে রাত্রে কাজে লাগিয়ে দেয়, এবং অমৃতলাল নিজেকে কাজে নিয়োজিত করে, কিন্তু ধানকেউটের মতো বেস্পতির সমর্থ শরীর ও মন তার অক্ষমতাকে কেবলই ছোবল এবং ছোবল দিতে থাকে। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এ গল্প লিখলে প্রৌঢ় অমৃতলালকে কলকাতার ফ্ল্যাটে নিয়ে আসতেন এবং বেস্পতিকে অনাঘ্রাতা কাজের মেয়ে বানিয়ে ভীমরতির বর্ণনায় মত্ত হতেন। শ্যামলের গল্প সে রকম নয়। তাঁর গল্পের গ্রামের দরিদ্র মেয়েরা জলপাত্ররূপে নিয়োজিত হতে চায়, গ্রামীণ পরিবেশে অবৈধ প্রেম উদ্ভব বিকাশ ও পরিণতি লাভ করে, কিন্তু নারী সেখানে নাগিনীর প্রকৃতিস্থ প্রতিমা হয়েই থাকে। *কে আসে নি* গল্পে দেখা যায় বেকার খগেন পরিবারের সবাইকে জড়ো করে সরকারি খালে লুকিয়ে রাতে মাছ ধরছে। একমাত্র তার স্ত্রী বেস্পতি সেখানে আসেনি। মাছ ধরতে গিয়ে খগেন এক মদ্দা কেউটে সাপ পেল, নিয়ে গেল শ্যামল বাঙালের কাছে। বর্ধিষ্ণু শ্যামল বাঙাল তখন তার নতুন জলপাত্র নিয়ে বসে আছে, সাপের জুড়ি ধরে আনলে খগেন আরো দু টাকা পাবে শ্যামলের এই লোভানিতে খগেন আবার খাল পাড়ে যায়। মনে পড়ে তার বিধবা মনিব কনক তার সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়ে খগেনের ছেলেকে সব দানপত্র লিখে গিয়েছিল, কিন্তু বেস্পতি কিছু নিতে দেয়নি, তাই খগেন এখন জুড়ি সর্পিনীকে খুঁজছে। একপ্রান্তে বেস্পতি অন্য প্রান্তে কনক, এর মধ্যে খগেনের টানাপোড়েন একদিকে সাপের জুড়ির সন্ধান অন্যদিকে শ্যামল বাঙালের রক্ষিতার উপস্থিতি সন্তুলিত সুষমা পেয়েছে। সস্ত্রীক ও সম্পন্ন গ্রামে আসা নাগরিক বাবুকে কেন গাঁয়ের মেয়েরা বলছে 'আমায় রাখিতো রাখো না গো' তা মনস্তত্ত্বের চেয়ে বেশি সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়, এ কথা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের পাঠকেরা অতি দ্রুত বুঝতে পারেন। *অন্নপূর্ণা* গল্পে উপোসি স্ত্রী প্রমীলা হিড়গাড়ির হাটে সপ্তাহে এক রাতের ঘর বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব করে সফল হয়, খগেন অনন্যোপায় হয়ে বোঝে স্ত্রীর বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া তাদের পরিবারের অন্য রুজি নেই।

পারিজাতের ইতিহাস ভূগোল গল্পে এক প্রৌঢ় পিতার দেখা মেলে, তিনি বেচালের জন্যে কলেজ-পড়ুয়া ছেলেকে প্রকাশ্যে প্রহার করেন এবং নিজে বিচলিত

হন, ছেলের জন্যে নির্বাচিত পাত্রীর কাছে প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে সে তরুণীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যান। এ বিষয় শ্যামলের একটি ছোটো উপন্যাসের প্রসঙ্গ হয়েছে, এবং তাঁর বেশ কিছু গল্পে পিতা এবং সন্তানের এবং অথবা সম্পর্ক প্রতিপাদনের উপযুক্ত রূপ গ্রহণ করেছে। *খুব অন্যায়* গল্পে যে প্রৌঢ় বাবা বিবাহিত তরুণ ছেলের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে তাকে একা যৌথ পরিবারে জীবন কাটিয়ে যেতে বাধ্য করেন, সন্তানের জনক হয়ে সে ছেলে প্রৌঢ় বয়সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে সে জেদি বাবা, বিধবা পুত্রবধূর কাছে, সেই স্বামীসুখ প্রায় বঞ্চিতার কাছে, পুত্রের অবর্তমানে পুত্রবধুর গৃহে তাঁর অধিকার সাব্যস্ত করে থাকবার দাবি জানান। পিতাপুত্রের এবং অথবা সম্পর্কের উভযোজ্যতা গ্রামের গল্পে গুণগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে যুক্ত হয়, *পারাপার* গল্পে মান্য মিস্ত্রিকে তার মাতৃহীন ছেলে নেপাল কড়া কথা বললেও আসলে ভালোবাসে, বাবা আর ছেলে লুকিয়ে লুকিয়ে রেঞ্চু চালিয়ে ইরিগেশনের পোলের পাটা খুলে নদীতে ভাসিয়ে কাঠগুদামে তুলে তার বদলে আটা কেরোসিন যোগাড় করে, ওভারসিয়ারের নৌকো ঠেলতে ঠেলতে সে ছেলে মহানন্দে বলে : আমি গজাল, বাপ আমার শোল। *লক্ষ্মণ মিস্ত্রির জীবন ও সময়* গল্পটি যেন ইলিয়াস সাহেবের রচনার স্বাদ আনে। লক্ষ্মণ আর শরৎ, ছেলে আর বাপ সম্পন্ন চাষি। ছেলে বাপকে শাসন করে, কিন্তু তাতে অন্তঃসলিলা ভালোবাসা বয়ে চলে। বাপ আর ছেলে দুজনের দুই অপয়া বউ ত্যাগ করার পর সৌভাগ্যবতী হয়েছে। প্রৌঢ় বাপকে নিয়ে তরুণ ছেলের নববিবাহিতা নতুন মাকে লুকিয়ে দেখা ছেলের ব্যসন। কিন্তু অসুস্থ লক্ষ্মণ শেষে আত্মঘাতী হয়। না নতুন-মা না উর্বরা মাটি কেউ তাকে আর আশ্রয় দিতে পারে না।

শ্যামলের প্রৌঢ়তার গল্প বেশি, সেই সঙ্গে বার্ধক্য নিয়ে লেখা গল্পও গুণে পরিমাণে কম নয়। *সিমেন্টের আয়ু* গল্পের পিতার বয়স তিরানব্বই এবং পুত্রের বয়স পঁয়ষট্টি। সুস্থ বাবা চান আরো বাঁচতে। আর ছেলে চায় বাবার মৃত্যুর মূল্যে অর্জিত স্বাধীনতা। অধিকারী পিতার বিপরীতে সন্তানের বিনীত বিদ্রোহের এ মুদ্রা কাফকায়েস্ক। *শীর্ষ সম্মেলন* গল্পে তিন বৃদ্ধ ভাই একত্র হয়ে পুরোনো গৃহস্থালির গল্প করে, সেখানে চড়ুই পাখি খড়কুটো দিয়ে নতুন সংসার গড়বার আয়োজন করে। *টেলিফোন* গল্পে মরতে চলেছেন বিরানব্বই বছরের দাদু আর নাতি বিয়ে করতে চলেছে। যেন এক বেতার টেলিফোনে স্বর্গস্থ দাদুর সঙ্গে নাতির পার্থিব যোগাযোগ সম্ভব হয়। *জীবনরহস্য* গল্পে জীবনের পরম্পরার এই রহস্য তন্ত্র ও হিন্দু জন্মান্তর ধারণার সহায়তায় অধিবাস্তবিক বিস্তার ও গভীরতা দাবি করে, কিন্তু স্বামী বা গুরু শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে না তার স্ত্রী লাবণ্যই তারা মা সেজে তাকে মাছ দিয়ে

গিয়েছে। মানবিক প্রসাদ লাভের সামর্থ্যে গল্পটি আরো বেশি অলৌকিক মহিমা লাভ করে। *পৃথিবীর ভার, অমৃতযোগ* প্রভৃতি গল্পে বেঁচে থাকার কঠিন আনন্দে মাতোয়ারা বৃদ্ধদের জটিল মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে শ্যামল যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার সঙ্গে তাঁর কিছু গল্প দূরান্বয়ী মিলে মেলানো সম্ভব মনে হয়। *সাক্ষী ডুমুর গাছ* গল্পে প্রায় নব্বুই-এর স্মৃতিভ্রষ্ট বৃদ্ধের হুইল চেয়ার ঠেলে মেল ট্রেনে তুলে দিয়ে মেয়েজামাই চমৎকার পরিত্রাণ পায়, ততদিনে তাদের উইলে সই আদায় করা হয়ে গিয়েছে বোঝা যায়। *শশাঙ্কশেখরের জীবনের খুঁটিনাটি* গল্পের চুরাশি বছরের বৃদ্ধের অবস্থাও পূর্বোক্ত বৃদ্ধের থেকে ভালো নয়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্য এক ধরনের গল্প আছে যেখানে পূর্বপুরুষের সঞ্চিত ধন পরম্পরায় বেড়ে ওঠে। *আরোগ্যনিবাস* গল্পে নিদানের এই রিকথ এক চিকিৎসক পরিবার পুরুষানুক্রমে ব্যবহার করে। বাংলার বাইরের শহর পাটনা ও সমকালের দূরের সময় আঠেরো উনিশ শতককে কাজে লাগিয়ে নাতি খোকা ডাক্তার, ছেলে বড়ো খোকনদা ও শতবর্ষের প্রবীণ ত্রিবেদী ডাক্তারের নিরাময়ের একটি ধারা তৈরি হয়। তারাশঙ্করের গল্পে একই বৃত্তিজীবী পিতাপুত্রে যে দ্বৈরথের পরিচয় আছে এই ত্রৈরথে সে সংঘর্ষ তেমন সংঘাতসংকুল হয়ে ওঠে না।

শীর্ষেন্দুর গল্পে যেমন উত্তরবঙ্গ তেমনি শ্যামলের গল্পে পূর্ববঙ্গের প্রসঙ্গ পুনরাবৃত্ত হয়ে আসতে থাকে। *স্মৃতির চেয়েও* ছোটগল্পে জীবনের চেয়েও যেন বড়ো শৈশব স্মৃতি ও ফেলে আসা দেশের জন্যে স্মৃতিকাতরতা ক্রম প্রবর্তিত হয়। দুই বন্ধু আব্বাস ও নলিনী তাদের পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের স্মৃতি বিনিময় করে, পরিণামে যন্ত্রণা পায়। তসলিমা নাসরিনের ফেরা একমুখী, এ গল্প দ্বিমুখী ফিরতে চাওয়ার আখ্যান। *উইপোকা* গল্পের প্রশাসক রেফিজুদ্দিন আর গবেষিকা মৃণালিনীর স্মৃতির নির্ভরে দুই দেশ, দুই জাতি, দুই যুগ, দুই যুগলের এ আখ্যান উইপোকার প্রেমপত্র নষ্ট করার স্বপ্নে করুণ রঙিন পরিণতিতে পৌঁছয়। দেশভাগ না হলে গল্পের কথক খুলনার উল্লাসিনী সিনেমা হলের গেটকিপার হতে পারতেন : শ্যামলের গল্পে এ বাক্যটিতে বার বার ইচ্ছাপূরণের আলো এসে পড়ে। তখন গল্পটিতে বিশ্বযুদ্ধ ব্ল্যাকআউট চেতাবনী ইভাকুয়েশনের সঙ্গে সঙ্গে শৈশবের স্মৃতির চলচ্চিত্রটিও সচল ও সবাক হয়ে ওঠে। *পুরোনো হিসেব* ও *হরিয়ালদা* গল্পে গ্রামের দুটি ভৃত্যস্থানীয় কিশোর তাদের তারুণ্যের স্পর্ধায় মহানগরীতে জীবন্ত ও অভিভাবক স্থানীয় কল্পচিত্রে রূপান্তরিত হয় : শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নব কৈশোরের প্রতি নিবিড় মমতা এ রূপান্তর বাস্তব ও বিশ্বাস্য করে দেয়।

গ্রামীণ পটভূমিতে শ্যামলের কয়েকটি চরিত্র যেন আদ্য চিত্রকল্পরূপে উপস্থিত,

এই চরিত্রগুলি বিভূতিভূষণের মানসলোকে জীবন্ত হতে পারত। *চন্দনেশ্বরের মাচানতলা* গল্পে ভগবান দেখতে পাওয়া ভালোমানুষ রিকশাঅলা, *কন্দর্প* গল্পের সুখ দুঃখে প্রায় নির্বিকার সুন্দর মানুষ গণেশ, *রাখাল কড়াই* বা *সিধু পালের হিমসাগর* গল্পে কাঠ বিক্রির পাশাপাশি শেকড় সন্ধানে প্রয়াসী মানুষজন এমন একটা পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে একমাত্র যেখানে বিভূতিভূষণের পাঠকেরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারবেন। কিন্তু এর ঠিক উল্টোদিকেই আছে দাঁতে নখে ভয়াল রক্তাক্ত জীবন যুদ্ধের জান্তব আয়োজন। *দখল* গল্পে বাদা অঞ্চলের পটভূমিতে দুই পুরুষ এক নারীর অধিকার সাপের শঙ্খ লাগার প্রতীকে সাব্যস্ত হয়, *কে আসে নি* গল্পে জুড়ি সাপের সন্ধান চলতে থাকে রাতভোর, তারাশঙ্করের ধরনে নারী ও নাগিনীর সমীকরণ ঘটে। *হাজরা নস্করের যাত্রাসঙ্গী* গল্পেও তারাশঙ্করের তুলনা মনে আসে, কিন্তু সহসা মহিষের কল্পচিত্রটি বড়ো হয়ে উঠে মৃত্যুর চেতনা মূর্ত হয়। *যুদ্ধ* গল্পে সাপ ও ব্যাঙ ধরার উভযোজী ছবিতে জীবন ও মৃত্যুর উভবলিতাযুক্ত সম্বন্ধ আভাসিত হয়। *কালকেপুরের রেলপুকুর* এবং *মৎস্য পুরাণ* গল্পে মাছ ধরার এক নতুন পুরাণ নির্মিত হয়, হেমিংওয়ে কথিত মাছ মারার কাহিনির আত্তীকরণ ঘটিয়ে গল্প দুটি নতুনভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হযে উঠতে চায়। *উর্বরাশক্তি* গল্পে শেয়ালগোষ্ঠী বা বাঘগোষ্ঠীর বেড়াল বেড়ালনির প্রজনন ও বাঁদরগোষ্ঠীর অন্যতম কথকের নাতির জন্ম পশু ও মানুষকে একটি প্রকৃতিস্থ সূত্রে বেঁধে ফেলে। *তারাবাজি* গল্পে জ্ঞান ও নির্জ্ঞানে গড়ে ওঠা সাপের ভূমিকা দিদিমা ও নাতিকে নতুন করে কাছে টেনে আনে, মৃত্যুর ওপর জাতকের জয় ঘোষিত হয়।

বিদ্যুৎচন্দ্র পাল সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় গল্পটি আরও সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় পাঠকের মনোরঞ্জন করতে পারতেন। *একজন সুদখোর বেকারের গল্প* নিবিড়তর নিসর্গে রেখে আরও ভাবাকুল ভঙ্গিতে বুদ্ধদেব গুহ বলতে পারতেন। এ সব গল্পে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নেই। *রাজ রাজেশ্বর* গল্পের যে সম্পাদক মরিয়া হয়ে স্বপ্ন দেখে চলে, *লেভেল ক্রসিং* গল্পের যে সাংবাদিক সততার অনুরোধে নিজের জীবন বিপন্ন করে, তারা শ্যামলের গল্পে সত্যতর প্রতীতি পায়। আয় ও আয়ুর ভারসাম্য রক্ষায় তৎপর বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়দের মধ্যে থেকে যে উত্তর যৌবন শিল্পী তরুণীকে ভালোবেসে ফেলে, *পাগলাঘন্টি* গল্পের যে কমল গুহ অলকা মিত্রের ঘরে ঢুকে তাকে পনেরো বছর আগেকার বীথি গুহতে রূপান্তরিত করে তারা শ্যামলের অনেক বেশি কাছের মানুষ। *ভাসান* গল্পে একদিকে বোধনের বাজনা বাজে অন্যদিকে সন্ধ্যার মেয়ের জন্ম হয়। বিজয়ার দিন সন্ধ্যা নার্সিংহোম ছেড়ে যায়, তখনও নার্সিংহোমে ঘুরে-বেড়ানো ফ্যালনাকে ছেড়ে আসার ব্যথায় সে প্রসূতি নতুন ক'রে

কাতর হয়ে পড়ে। শ্যামল এই নবজন্মের গল্পকার, বাদা অঞ্চলে নতুন গল্প পত্তনের কাহিনি, নতুন আবাসন গড়ে ওঠার আখ্যান তাঁর মতো করে আর কেউ রচনা করতে পারেন না। সূচিপত্তনের কাহিনিতে অগ্রজ অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। শ্যামলের ছোটগল্প তাঁর *শশাঙ্কর দোতলা* গল্পের মতোই দ্বিতল, বাস্তবের যেমন তেমন ভিতের ওপর এলেবেলে করে বানানো বাড়ির মতো তাঁর গল্পের আপাত শ্রীহীন একতলা তৈরি হয়, এবং তারপরেই কিভাবে যেন প্রায় ভিত্তিহীন দোতলার বিপজ্জনক অধিসৌধটি নির্মিত হয়, হেলানো মিনারের মতো টলে গিয়েও দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যেই যেন তাঁর শিল্পের সৃষ্টি। আনন্দবাজার বুদ্ধদেব গুহকে বনাঞ্চল, শীর্ষেন্দুকে ধর্মক্ষেত্র, মতি নন্দীকে ক্রীড়াক্ষেত্র এবং শ্যামলকে কৃষিক্ষেত্র সাহিত্য রচনার চৌহদ্দিরূপে নির্দেশ করে দিয়েছিল মনে হতে পারে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যে সীমানা অবলীলায় অতিক্রম করে চলে এসেছেন। *নৃপেনদের বাড়ি* গল্পে গৃহকর্তার ইঁট তৈরি করে পুড়িয়ে বানানো গ্রামের পরিত্যক্ত বাড়ি জীবন্ত হয়ে থাকে, তাতে মৌমাছি বাসা বাঁধে, আগুন দিয়ে মৌমাছি তাড়ালেও ঘরের মধ্যে ঘরের মতো মৌচাকটি থেকে যায়। ঘরের মধ্যে ঘর তৈরির এমন সৃষ্টিশীল গল্পে শ্যামলের বস্তুগত অথচ প্রাতিভাসিক সৃজনী প্রক্রিয়ার রহস্য নতুন করে ধরা দিতে চায়।

গল্পকার শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় যেন বার বার বলেন : আমি মিথ্যা কথা বলি। এ উচ্চারণ মিথ্যাবাদীর? এ কণ্ঠস্বরে কী আছে অনৃতভাষণ? সত্য বা মিথ্যার এ কূটাভাসে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই গুচ্ছগল্প প্রায়শ সফল ও সম্পূর্ণ।

বানান অপরিবর্তিত।
এবং মুশায়েরা, শারদীয়, ২০০০ প্রকাশিত।